এই সময়

* কথাসরিৎ *

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।

— কাজী নজরুল ইসলাম

নবীনবরণ

পরিবর্তিত হচ্ছে ভারত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তনের হাওয়া। কিছু কিছু বর্ষীয়ান নেতার পক্ষে এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ কেউ সে বিষয়ে নিজস্ব ক্ষোভ গোপন করছেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসমক্ষে প্রকাশিত তাঁদের এই উষ্মা সংবাদমাধ্যমে দলীয় কোন্দল হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু এ শুধু কে কোন আসন থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা নিয়ে মতবিরোধের বিষয় নয়। বিষয়টি গভীরতর। আসলে এ হল আগামী দিনের ভারত সম্পর্কে ভারতীয় ভোটারদের কল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অবশ্যম্ভাবী মূলগত ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা রাজনীতিকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে কিছু বর্ষীয়ান নেতার অপারগতা। উপনিবেশ থেকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মের পর প্রথম অর্ধ শতক তাকে প্রগতিমুখী ও স্বনির্ভর করাই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিকদের প্রধান লক্ষ্য। সে সময় বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও নাগরিকদের সামনে তুলে ধরা বিকল্প নীতিগুলি ছিল এক প্রকার। এক কথায় তা ছিল প্রধানত অন্তর্মুখী। উদাহরণস্বরূপ, গণতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা, খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতা, দেশব্যাপী বিদ্যুতায়ন ইত্যাদির গুরুত্ব ছিল সর্বোপরি।

সে ক্ষেত্রগুলিতে এক রকমের সাফল্যলাভের পর, বিগত দুই দশকে ভারত বিশ্বমঞ্চে নিজের স্থান সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছে। ঘরের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজার অর্থনীতিতে যোগদান হয়ে উঠেছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তথ্যপ্রযুক্তি থেকে বৃহৎ শিল্প পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের সম্ভাব্য গন্তব্য হিসাবে ভারতকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প নীতিগুলি ভোটারদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করাই আজকের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। মনে রাখা প্রয়োজন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে প্রথম বার ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। অর্থাৎ এঁদের ভোটই দুটি দলের মধ্যে জয়-পরাজয়ের পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এই নবীন ভোটারদের কল্পনার ভারত বিশ্বমুখী, উন্নত, প্রতিযোগী ভারত। সে কল্পনা সার্থক করতে হলে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতির প্রাচীন কাঠামো পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। অভ্যন্তরীণ নীতিকে সরাসরি যুক্ত করতে হবে শীত-যুদ্ধোত্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব কূটনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে। ফেলে আসা দিনের শত্রু-মিত্রের সমীকরণগুলি বদলে ফেলার সাহস দেখাতে হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আজকের বিক্ষুব্ধ বর্ষীয়ান রাজনীতিকদের অনেকেরই ভারতের এই পরিবর্তনে যথেষ্ট অবদান আছে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নবীনতরদের স্থান ছেড়ে দেওয়াই যে কোনও বিচক্ষণ রাজনীতিকের সব থেকে বড় গুণ। সে কথা মাথায় রেখে অনেকেই এবারের নির্বাচন থেকে সসম্মানে সরে দাঁড়িয়েছেন। যাঁরা এখনও সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, তাঁরা নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করলে বহুক্ষেত্রেই অকারণ তিক্ততা এড়ানো সম্ভব হবে এবং রাজনীতিও হবে সম্মুখগতি।

রং রুট

মামা, খুড়ো, চাচা, পিসের সঙ্গে সাধারণ বা অসাধারণশীলেবুদের স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্কগুলিকে পঙ্কিল করে এমন ক্ষমতা সামান্য ইহজাগতিক রাজনীতির কোথায়! তেমনটা সম্ভব হলে মানবজাতি সম্পূর্ণ ফৌত হয়ে যেত কবেই। হালে এক চাচা ভাইপোর আপ্যায়নে দুধ-ছাড়া চায়ের ব্যবস্থা করলেন পানীয়ের খোঁচা-মারা রংটির জন্যই। চেয়ারের ব্যবস্থাও হয়েছিল আদর করে বসানোর জন্য এবং সেটির রং-ও ছিল চায়ের রং-এর সঙ্গেই সাযুজ্য বজায় রেখে। আহ্লাদ আবদারের সম্পর্ক, খুনসুটি, ঠাট্টায় প্রগাঢ় হয়ে ওঠে তা আরও। রাজনৈতিক দলাদলি হানাহানি থাকবেই, আধুনিক মানবের অঙ্গে ওই দলীয় পরিচয়ের তকমা যে রকম অবিচ্ছেদ্য রূপে সেঁটেছে রাজনীতির সীমাটিকে নিরন্তর ছেঁটে কেটে, তাতে সাধ করে অপরিচিত রাজনৈতিক ভাষার আবর্ত থেকে নিজের নিজের জীবনের জন্য অর্থবহ শব্দ খুঁজে নতুন সুহৃদ তৈরির অবকাশ নেই বললেই চলে। আপন আপন স্কোয়ার-ফুট কষা ভিটে-ফ্ল্যাটের মাপে আপনার আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাস-বিশ্বকেও তাই একরৈখিক বিচ্যুতিহীন একরঙা একঢালা পথে চালাতে মরিয়া এ যুগের সদা-সচেতন সতর্ক মানুষ। সচেতনতার সীমাটিও সেখানে নির্দিষ্ট এবং পূর্বনির্ধারিত। বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই, একদমই দুই মেরুর দুই রাজনৈতিক কর্মীর অপরকে চিহ্নিত করার বা নিজেদের উপর রাজনৈতিক সচেতনতা সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রক্রিয়াগুলিকে কাঁটাছেঁড়া করলে দেখা যাবে যে সেগুলোর বুনিয়াদি চরিত্র একদম এক। যেন বা কারখানায় একটিই ছাঁচে মাল তৈয়ার করে দুই রকম রং-এ রাঙিয়ে দু'দলের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং তারাও, আহা কী নতুন, একদম আমার কথা ভেবেই এক্সক্লুসিভ কেরামতির জিনিস বানানো হয়েছে ইত্যাদি ভেবে উৎফুল্ল চিত্তে আটখানা হয়ে উঠেছেন। মুশকিল হল, সে যে এক বীভৎস মজার প্রস্তুতি বই আর কিছু নয়, সেটি অ্যাদ্দিনেও হৃদয়ঙ্গম হল না। কাটাকাটির রূপরেখা তৈরি হয় দুয়ার এঁটে, বাইরে থেকে উৎকণ্ঠ চিত্তে কেউ যে কড়া নাড়ে না তাও নয়, কিন্তু জলে ভেসে যাওয়া প্রতিটি শবদেহে একটাই মুখ বসানো, ক্ষতচিহ্নগুলিও এক। বাঙালি রক্তের দাগ ধরে তামাম বিভেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মগজে জমিয়ে রাখবে এমনটা আশা করাও অন্যায়।

এই রকম পরিস্থিতিতে বিরোধী প্রার্থীকে চা-পানের দাওয়াতে নিমন্ত্রণ জানানো, বা নবিশ প্রার্থী কী উপায়ে ঠাঠা পোড়া রোদে ভোট ভিক্ষা করে বেড়াবার কালে সুস্থ থাকবেন সে সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া অন্য এক সমান্তরাল ভাষায় রাজনীতির সর্বগ্রাসী রূপটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়। সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা সহজে পৌঁছে দেওয়ার পথটি পয়লা তৈরি করা দরকার, যা গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রথম শর্ত। সাধারণ মানুষের সে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলে ওই গণতন্ত্রের যেমন কোনও মানে থাকে না, হিংসার রাজনীতিকেই গণতন্ত্রের আসলি এবং একমাত্র পাকাপোক্ত রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠার তরে মানুষের অংশগ্রহণও তেমনই অর্থহীন। চা, অথবা চেয়ার যে রংয়েরই হোক না কেন, চাচা ভাতিজাদের দেখা সাক্ষাৎ চলতেইও থাকুক। ওতেই সকলের মঙ্গল সাধিত হবে।

* অসংখ্যা *

৩০০৫০০০

(তিরিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার দিয়ে টড ম্যাকফারলেন ১৯৯৮ সালে কেনেন মার্ক ম্যাকগুয়ার-এর খেলা একটি বেসবলের বল। এখনও পর্যন্ত সব থেকে দামি বেসবল স্মারক।

* দিনকেদিন *

২৫ মার্চ

১৮৯৮: মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা নেন।
১৯০৮: চিত্রপরিচালক ডেভিড লিন জন্মগ্রহণ করেন।
১৯১৪: ফরাসি কবি ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল প্রয়াত হন।
১৯১৯: ভ্রমণকাহিনি লেখক সুবোধকুমার চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন।

পার্টি নেতৃত্ব মানেই তো উচ্চবর্ণ!

'নেতা তো তৈরি করা যায়। মুসলমান, দলিতদের কেন করছেন না? তারাই তো জনগণের মধ্যে, পার্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ।' দলের মধ্যে প্রশ্ন তুলছিলেন **রেজ্জাক মোল্লা**। একান্ত আলাপে অমল সরকার

এই সময়: ঠিক কোন সময়, কী কারণে পার্টির সঙ্গে আপনার বিরোধ বাধল?
রেজ্জাক মোল্লা: প্রধান কারণ জমি। ২০০৫-এর একদম শেষের দিক, আমি তখন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী। কিপিং মি ইন ডার্ক হঠাৎ ভাঙরে জমি মাপতে চলে গেল। বলা হল, সালিমের প্রজেক্ট হবে। তার আগে ভাঙরে বুদ্ধদেববাবু গ্রাঁপির জন্য জমি নিতে চাইলেন। বললেন, শিল্পপতিরা এসব পছন্দ করে। আর শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন পার্টির চোখের মণি, বামনঘাটায় প্রায় সাড়ে পাঁচশো বিঘার ফিশারিকে ঘিরে লেক ল্যান্ড সিটি করতে চাইলেন। আমি লোকজন নিয়ে দু'টোই আটকে দিলাম। বললাম, গরিবের ভাতের থালা কেড়ে নিতে দেব না। রাজ্য সম্পাদক তখন অনিল বিশ্বাস। সালিমের প্রকল্প নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখে মন্ত্রিত্ব ছাড়লাম। উনি আমাদের ডাকলেন। ঠিক হল, বুদ্ধদেববাবু গিয়ে বলবেন, ভাঙরের কোনও জমি নেওয়া হবে না। এরপর সিঙ্গুর। আমি বলেছিলাম কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না। তার পর থেকে ওঁরা, মানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিরুপম সেনরা আমাকে খুব হেনস্থা করার চেষ্টা করলেন। ভূমি দপ্তরের উপর শিল্প দপ্তরকে চাপানো হল। আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ রইল না। আমি বললাম, চাষির ভাতের থালা কেড়ে নিলে, পাল্টা ভাতের থালা দিতে হবে, শাল পাতা দিলে মানবে না। অর্থ ওঁরা বুঝলেন না। উচ্চস্তরের লোক তো। আমাদের পার্টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) বিরুদ্ধে। ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের বিরুদ্ধে। সালিমের প্রজেক্ট নিয়ে তাই প্রশ্ন তুললাম। নয়াচরের কয়েকশো কোটি টাকার জমি ২৭ কোটি টাকায় দেওয়ার কথা বলা হল। বললাম, পারব না। তখন জমিটাই শিল্প দপ্তরের হাতে নিয়ে নেওয়া হল। একটা সময় বলা হল, আমার অসহযোগিতার জন্যই নাকি শিল্প হচ্ছে না। বিমান বসুকে চিঠি দিয়ে বললাম, আর মন্ত্রী থাকতে চাই না। হাওড়ার সলপে সালিমদের উপনগরীর জন্য জমি দেওয়া হল '৮০ সালের দামে। আপত্তি করলাম, শোনা হল না। টোকেন দাম নিয়ে কয়েকশো কোটি টাকার জমি শিল্পপতিদের দিয়ে সরকারি কোষাগারের ক্ষতি করা হয়েছে।

এ সব নিয়ে যদি কোনও কমিশন হয়?
সব বলব, কাগজপত্র দেব। তবে মুখ্যমন্ত্রীর তেমন ইচ্ছা আছে বলে তো মনে হয় না। উনি জমি নিয়ে সিআইডি তদন্ত করাচ্ছেন। উচিৎ ছিল বিভাগীয় তদন্ত করানো।

এ সব কথা কি পার্টির উপরতলায় জানাননি?
দিল্লি গিয়ে প্রকাশ কারাতকে বলেছিলাম। উনি বললেন, রাজ্য কমিটিকে চিঠি দিয়ে বলেছি, সালিম নিয়ে যেন এগনো না হয়। ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, সে চিঠি কই। তখন আমতা আমতা করছে। বললাম, রাজ্য কমিটিকে দেওয়া চিঠি চেপে যাচ্ছেন কাদের স্বার্থে? সম্পাদকমণ্ডলীর সবাই চুপ। কেন?

তার পর?
রাজ্য কমিটির একটি বৈঠক শেষে বুদ্ধদেববাবু আমাকে বললেন, আপনি জুরাসিক এজ-এ আছেন। আমি বললাম, আপনি জুরাসিক পার্কে থাকবেন। তা উনি ভোটে হেরে সেখানেই চলে গেলেন। পার্টির মধ্যে আমি একের পর প্রশ্ন তুলেছি। বিশেষ করে এই প্রশ্নটা যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ অন্যত্র জাতপাতের রাজনীতি হোক আর যা হোক, বিভিন্ন দল বাড়ছে। এ দিকে নজর দেওয়া উচিত। বলা হল, আমরা জাতপাতের রাজনীতি করি না। বললাম, আপনারা মার্কসবাদী তো! বাস্তবটা এড়াচ্ছেন কেন? বিজয়ওয়াড়ায় পার্টির প্লেনামে বললাম, ডাউনট্রডেনদের প্রবলেমকে জাতপাতের কথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। দেখলাম, বৃন্দা কারাতের নেতৃত্বে আদিবাসীদের জন্য একটা কমিটি হল। আমি বললাম, তা হলে দলিত-মুসলিম নয় কেন? নেতারা বললেন, আদিবাসীরা ক্ষুদ্র অংশ, সবচেয়ে ডাউনট্রডেন। ওদের জন্য একটা চেষ্টা হল। আমি বললাম, এটা যুক্তি হল না।

আপনার মানদণ্ডটা কী?
অবশ্যই আর্থিক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আমি আস্থাশীল। তবে আমার মতে, কাস্ট প্রবলেম যেখানে আছে, সেখানে সেই সমস্যার সমাধান না করে ক্লাস স্ট্রাগল হবে না। এদেশে কাস্ট স্ট্রাগল ক্লাস স্ট্রাগলের পূর্ব শর্ত। ক্লাস স্ট্রাগল ব্যর্থ হচ্ছে কারণ, পূর্ব শর্তটাকে আমরা ধরছি না। সে জন্য জয়ললিতা, মুলায়ম, লালু, নীতীশ এঁদের হাতে পায়ে ধরছি। আমরা যদি কাস্ট স্ট্রাগল করতাম তা হলে ওই সব রাজ্যে চ্যাম্পিয়ন হতে পারতাম। ওঁদের হাতে পায়ে ধরে ঘুরে বেড়ানোর দরকার হত না।

পার্টি কী বলল?
বলল, কমিউনিস্ট পার্টিতে এ সব হয় না। আমি বললাম, পার্টিতে ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজমের নামে সেন্ট্রালিজম আছে, ডেমোক্র্যাসি নেই। আর সেন্ট্রালিজমের নামে যা আছে, তা পার্টি বুরোক্র্যাসি। বলা হল, পার্টি বুরোক্র্যাসি নেই। আপনাকে তো বলতে দেওয়া হয়। আমি বললাম, বলতে দেন, কিন্তু, তার পর যে সিদ্ধান্ত

অভীক পুরকাইত

করেন তাতে আমাকে হাত তুলতে হয়। এই ব্যবস্থা কি করা যায় না যে ভিন্ন মতটা পার্টির নিচু তলায় পৌঁছে দেওয়া হবে। দল যে পার্টি চিঠি বের করে তাতে লিখে দিন, যে দু-চারজনের দ্বিমত আছে। তাতে কমরেডরা খোঁজবার চেষ্টা করবে কে দ্বিমত পোষণ করেছে, কেন করেছে। আরও বললাম, সম্মেলনে কমিটি গঠনে ইলেকশন আনকনটেস্টেড কেন? ভোটাভুটিকে ভয় কী? ফ্লোর থেকে প্যানেল চাওয়া হোক। নেতৃত্ব কেন নেতা চাপিয়ে দেবে? কর্মীরা নেতা বাছাই করে নিক। প্রশ্ন তুললাম, পশ্চিমবঙ্গে উনিশটা জেলা। একটা জেলাতেও মুসলমান সম্পাদক নেই কেন? মুর্শিদাবাদে ৬৭ ভাগ মুসলমান। সেখানে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জেলা সম্পাদক হবে কেন? মইনুল হাসান কি রাজমিস্ত্রি? বলা হল, নেতা তো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। আমি বললাম, নেতা তৈরি করা হোক। প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখলেন পুরনো নেতারা প্রয়াত হচ্ছেন, ফাঁক ভরাট করা দরকার, কতগুলো লোককে বসিয়ে দিলেন। কেউই নেতা না, রাজ্য কমিটির নেতা হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র সুভাষদা (প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী) জেলা কমিটিতে ছিলেন। যাঁর জনভিত্তি ছিল। আর ছিল বিমানদার। আর সব ফলস লিডার। আমি

> রাজ্য কমিটির একটি বৈঠক শেষে বুদ্ধদেববাবু আমাকে বললেন, আপনি জুরাসিক এজ-এ আছেন। আমি বললাম, আপনি জুরাসিক পার্কে থাকবেন। তা উনি ভোটে হেরে সেখানেই চলে গেলেন। পার্টির মধ্যে আমি একের পর প্রশ্ন তুলেছি। বিশেষ করে এই প্রশ্নটা যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ অন্যত্র জাতপাতের রাজনীতি হোক আর যা হোক, বিভিন্ন দল বাড়ছে। এ দিকে নজর দেওয়া উচিত।

বললাম, নেতা তো তৈরি করা যায়। মুসলমান, দলিতদের কেন করছেন না? তারাই তো জনগণের মধ্যে, পার্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কী হল?
জেলা কমিটির সিংহভাগ আমাকে জেলা সম্পাদক করতে চাইল। বিমানদাও বললেন, আমরা রাজ্য নেতৃত্ব থেকে কারও নাম চাপিয়ে দেব না। কিন্তু জেলা সম্পাদক নির্বাচনের দিন বললেন, রেজ্জাককে করা যাচ্ছে না, কারণ ওঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দিলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে রং মেসেজ যাবে। আমি বললাম, এ তো উল্টো বলছেন। বরং ভালো মেসেজ যাবে যে, মন্ত্রিত্ব ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হয়েছে। আমি বিমানদাকে বললাম, আমাকে করবেন না আগে বললেন না কেন? বললেন, আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু বুদ্ধ আর নিরুপম চাইল না। আমি বললাম, কাকে করবেন বলুন। বলল, সুজনকে। সুজনের নাম জেলা কমিটির বৈঠকে আমিই প্রস্তাব করলাম। তারপর ঋতব্রতকে রাজ্যসভায় নমিনেশন দেওয়ায় আপত্তি করলাম। যাঁর জায়গায় তাঁকে পাঠানো হচ্ছে তিনি ছিলেন রাজবংশী। বললাম, এমন কাউকে করা হোক। শ্যামল চক্রবর্তী বললেন, পার্লামেন্টে ইংরেজি বলতে হবে। এখন দেখছি, লোকসভায় বারো জন মুসলিমকে প্রার্থী করেছে সিপিএম, তাঁরা কি সবাই ইংরেজি বলতে পারেন? এঁদের তো আগেই নেতা করা যেত। পার্টিটাই তো আসল।

পার্টি আপনার কথা শুনল না কেন?
নেতৃত্ব উচ্চবর্ণের দখলে। পশ্চিমবঙ্গে সব দলই উচ্চবর্ণের দখলে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভায় ৪১ শতাংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। মমতার মন্ত্রিসভাতেও তা-ই। আমাকে বলা হল, আমি যা বলছি, তাতে ভবিষ্যতে পার্টির ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমার মনে হয়, ভালো হবে। কিন্তু আমার কথা শোনা হল না। তারপর থেকে আমি আর পার্টির মিটিংয়ে যেতাম না। শুধু একজনকে বললাম, আপনারা যদি মনে করেন, রেজ্জাক মোল্লাকে বনসাই করে রাখবেন, পারবেন না। কনভেনশন ডাকলাম। হিসাব দিয়ে দেখালাম, ছয় ভাগ হচ্ছে উচ্চবর্ণের লোক, ২৭ ভাগ হচ্ছে মুসলমান। ২৩ ভাগ এসসি। এসটি হচ্ছে ছয় ভাগ। এটা মিললে প্রায় ৫৬-৫৭। এরাই মেজরিটি। এর সঙ্গে ৪০ ভাগ ওবিসি মিললে উচ্চবর্ণের তো আর পাত্তা নেই। যার যতো সংখ্যা ভারি, তার তত ভাগিদারি। ডেমোক্র্যাসিতে এক মাথা এক ভোট। আমার যদি সাতাশটা মাথা থাকে তা হলে আমার সাতাশটা ভোট। আপনার ছয় মাথা থাকলে আপনার ছয় ভোট। কিন্তু এই যে সবটার উপর মাতব্বরি করছেন এটা মানব না। এই আপার কাস্ট হেজিমনি ভেঙে দেব। ঘোষণা করে দিলাম, উত্তরবঙ্গ থেকে একজন দলিত মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কেপিপি, গ্রেটার কোচবিহারের সমস্যা অনেকটা মিটে যাবে। বঞ্চনায় প্রলেপ পড়বে।

দলে গুরুত্ব না পেয়ে আপনি এ সব বলছেন, এই সমালোচনার জবাব আছে আপনার কাছে?
আমি না চাইলে সুজন জেলা সম্পাদক হতে পারত? আমি তো বলেছি, আর ভোটে দাঁড়াব না। পার্টি আমাকে কৃষকসভার বড় পদে বসিয়েছিল। আমি ক্ষমতা চাইনি।

সাচার কমিটির রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনে মুসলিমরা প্রায় হাতে গোনা কয়েকজন। সংরক্ষণ থাকলেও তফসিলিরাও বঞ্চিত। আর ওবিসি-র অস্তিত্ব তো বামফ্রন্ট সরকার এক সময় মানতেই চায়নি। জ্যোতি বসু সাড়ে ২৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনিও তো তো এদের জন্য কিছু করেননি।
আমি এবং হাসিম আবদুল হালিম কয়েকটা কথা জ্যোতিবাবুকে বলেছিলাম। তিনি পার্টিকে বলেছিলেন। কিন্তু ওঁর কথাও শোনা হয়নি। সিপিএমের মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু মানে সিপিআইয়ের মতো অবস্থা হবে। সিপিআইয়ের এক সময় গোটা দেশে শক্তি ছিল। এখন কোথায়? লোকসভা ভোটের পর সিপিএমে গোলমাল লেগে যাবে। ঘুরে দাঁড়ানার জন্য কাঠামো বদল দরকার। কাঠামো বদলানোর মুরোদ কারও নেই। আমি অনেক আগেই নেতৃত্ব বদলের কথা বলেছিলাম। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দলটাকে শেষ করে দিয়েছেন।

কিন্তু একা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এত বড় ক্ষতি করলেন কী করে? রাজ্য কমিটি, সম্পাদকমন্ডলী, পলিটব্যুরো, এখানে তো আরও অনেকে আছেন।
রাজ্য কমিটির কোনও ভূমিকা নেই। সম্পাদকমন্ডলীতেও তিন-চার জনই শেষ কথা। বিশেষ করে যাঁরা পলিটব্যুরোর সদস্য। বিমানদা ভালো মানুষ। তিনি বাকিদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না।

দলিত মুখ্যমন্ত্রী হলেই সব সমস্যার সমাধান?

এমনই স্ববিরোধ আছে রেজ্জাক মোল্লার বর্তমান রাজনীতিতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নতুন রাজনৈতিক পথের সাফল্যের সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আত্মপরিচয়ের রাজনীতি প্রসঙ্গে **মইদুল ইসলাম**। প্রথম পর্ব

এই মুহূর্তে ভারতে বামপন্থী রাজনীতির সংকট নিয়ে মোটামুটি ভাবে একটি ব্যাপক ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের রাজনৈতিক এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতপাত, ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্ব, লিঙ্গবৈষম্য এবং পরিবেশের মতো নতুন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বামপন্থীদের তরফে এই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির গুরুত্ব যথাযথ ভাবে স্বীকার করতে গেলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পুরনো আদলটিকে ফিরে দেখা দরকার। কিন্তু বামপন্থীরা কোন তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করবে এই ধরনের নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে? সে ব্যাপারে মতানৈক্যের মাত্রাটি যথেষ্ট গভীর। অনেকে আছেন যাঁরা 'শ্রেণি সংগ্রাম'-কে অগ্রাধিকার দিতে চান, অন্য যে কোনও রকম 'অ-শ্রেণি' সংগ্রামের তুলনায়। আবার, অনেকেই আছেন যাঁরা আত্মপরিচয়ভিত্তিক (আইডেনটিটি) 'শ্রেণি সংগ্রাম'-এর উপর মনোনিবেশেই বেশি আগ্রহী। রাজনৈতিক দর্শনের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, এই দুই দলের মধ্যে একটি মিল আছে। কারণ উভয়ই মূলত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির কর্মসূচি রূপায়ণ করতে চাইছে। এক দলের নজর 'শ্রেণি' অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষকদের উপর। আর এক দল চাইছে পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী, অর্থাৎ দলিত, আদিবাসী, মুসলিম এবং নারীদের সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিতে। কিন্তু কর্মসূচির এই আপাত-মিলটুকু থাকলেও, 'শ্রেণি সংগ্রাম'-এর ভিত্তি অর্থনৈতিক বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সাম্য। অন্য দিকে, প্রান্তিক শ্রেণির সংগ্রামের সপক্ষে যাঁরা সওয়াল করছেন, তাঁদের মূল ভাবনা সামাজিক ন্যায় এবং আত্মপরিচয়ের অধিকার নিয়ে।

বামফ্রন্টের পূর্বতন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী এবং সি পি আই এম-এর বহিষ্কৃত নেতা আবদুর রেজ্জাক মোল্লা সম্প্রতি একটি সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন এই মঞ্চ প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠীদের, বিশেষত মুসলিম এবং দলিতদের, অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরবে। ইতিপূর্বে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে, রেজ্জাক মোল্লা কৃষক নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, এবং অনেক বার তাঁকে শোনা গিয়েছে তাঁর কৃষক পরিচিতি ('চাষার ব্যাটা') নিয়ে গর্ব করতে। ২০০৫ সালে তিনি সি পি আই এম-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বিভিন্ন বড়ো শিল্প প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। গ্রামের মানুষদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বোঝা গিয়েছিল ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। বামপন্থীদের জন্য কঠিন সেই নির্বাচনেও তিনি ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রায় ২১০০০ ভোটের ব্যবধানে জেতেন। অন্য দিকে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী— সি পি আই এম-এর প্রায় সব বড়ো নেতাকেই সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁদের সেই নির্বাচনে হার স্বীকার করতে হয়। এখন রেজ্জাক মোল্লা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দলিত এবং মুসলিম আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিকে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। রেজ্জাক মোল্লা একটি বিষয়ে সম্পূর্ণত সচেতন— পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজের মধ্যে এক বিপুল অংশ হয় মুসলিম ধর্মাবলম্বী, নয় তো দলিত। রেজ্জাক মোল্লার এই নতুন রাজনীতি আদৌ মুসলিম বা দলিতদের আকর্ষণ করবে কি না তা সময়ই বলবে।

শুভ্রজিত চক্র

কিন্তু রেজ্জাক মোল্লার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে তিনটি মৌলিক স্ববিরোধ লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রথমত, তিনি পশ্চিমবঙ্গে এক জন দলিত মুখ্যমন্ত্রী এবং মুসলিম উপমুখ্যমন্ত্রীর জন্য সওয়াল করছেন। মনে হচ্ছে এই দুই মন্ত্রিপদে এক জন দলিত এবং এক জন মুসলিম বসলেই রাজ্যের এই দুই প্রান্তিক গোষ্ঠীর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদি তা-ই হত, তা হলে উত্তর প্রদেশে মায়াবতীর মুখ্যমন্ত্রিত্ব, বা জম্মু ও কাশ্মীরে ওমর আবদুল্লার মুখ্যমন্ত্রিত্বের ফলে উত্তর প্রদেশের দলিতদের বা জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিমদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমরা সবাই জানি যে সেটা হয়নি। দ্বিতীয়, রেজ্জাক মোল্লার রাজনৈতিক অবস্থানের এক রকমের বদল ঘটেছে— জমি অধিগ্রহণের রাজনীতি থেকে আত্মপরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির দিকে। মানে রাখা দরকার, সি পি আই এম-এর তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা লক্ষ্মণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লার সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চের সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্ববিরোধটা এখানেই। লক্ষ্মণ শেঠই সি পি আই এম-এর সেই বাহুবলী নেতা, মূলত যাঁর জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নন্দীগ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তৃতীয়ত, রেজ্জাক মোল্লা এখনও পর্যন্ত কৃষক-পরিচিতি এবং মুসলিম বা দলিত পরিচিতির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হননি। য